সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা (Definition of Sovereignty)

রাষ্ট্রের যে-চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলির মধ্যে সার্বভৌমিকতা হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সার্বভৌমিকতা ছাড়া রাষ্ট্রের কল্পনাই করা যায় না। বস্তুত, এই ক্ষমতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে স্বকীয়তা প্রদান করেছে।

বিভিন্ন সংজ্ঞা

লাতিন শব্দ 'সুপারেনাস্' (*superanus*) থেকে ইংরেজি 'সভরেন্টি' শব্দটি এসেছে। 'সুপারেনাস্' শব্দটির অর্থ 'সর্বশ্রেষ্ঠ' (supreme)। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সার্বভৌমিকতা বলতে **রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অবাধ ক্ষমতাকেই** বোঝায়। ফরাসি দার্শনিক **বোদাঁর** ভাষায়, "আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত নাগরিক ও প্রজাদের ওপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাই হল সার্বভৌম ক্ষমতা।" **হুগো গ্রোটিয়াস** (Hugo Grotius)-এর মতে, কোনো ব্যক্তির হাতে অর্পিত চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাই হল সার্বভৌমিকতা। এই ব্যক্তির কার্যকলাপ যেমন অন্য কারো অধীন নয়, তেমনি তাঁর ইচ্ছাকেও কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। **বার্জেস** সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে অধস্তন ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলির ওপর রাষ্ট্রের মৌলিক, চূড়ান্ত ও সীমাহীন ক্ষমতাকেই বুঝিয়েছেন। **উইলোবি** 'রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছা'কে সার্বভৌমিকতা বলে অভিহিত করেছেন। আইনানুসারে সংগঠিত জনসমাজ বা রাষ্ট্রীয় এলাকার মধ্যে উদ্ভূত সর্বপ্রকার আইনগত দ্বন্দ্বের আইনসংগত মীমাংসার জন্য যে-চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে, **বার্কার** তাকেই সার্বভৌমিকতা বলেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **পোলকের** মতে, সার্বভৌমিকতা বলতে সেই ক্ষমতাকে বোঝায়, যা অস্থায়ী নয়, অর্পিত নয় ও কোনো নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় এবং যাকে রাষ্ট্র পরিবর্তন করতে পারে না। **জেলিনেক** সার্বভৌমিকতাকে রাষ্ট্রের সেই বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যার ফলে নিজের ক্ষমতা ছাড়া অন্য কারো ক্ষমতার দ্বারা রাষ্ট্রীয় শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় না। **ব্ল্যাকস্টোন** (Blackstone)-এর মতে, সার্বভৌমিকতা হল রাষ্ট্রের 'সর্বোচ্চ, অনতিক্রম্য, চরম ও সীমাহীন কর্তৃত্ব'। **দ্যুগুই** বলেছেন, রাষ্ট্রের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতাই হল সার্বভৌমিকতা। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রের মাধ্যমে সংগঠিত সমগ্র জাতির ইচ্ছার প্রকাশ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র তার নিজ ভূখণ্ডে বসবাসকারী সব ব্যক্তিকে নিঃশর্তভাবে নির্দেশ দিতে পারে। **বার্জেস** সার্বভৌম ক্ষমতাকে 'সব ব্যক্তি ও সংঘের ওপর প্রযোজ্য একটি মৌলিক চরম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা' বলে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী র‍্যাফেল সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, 'রাষ্ট্র সার্বভৌম'—এই কথাটি বলার অর্থ হল সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত বা চরম কর্তৃত্ব রয়েছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের আইন অন্যান্য সংঘের নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রের আইনের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংঘের নিয়মকানুনের বিরোধ বাধলে রাষ্ট্রের আইনই বলবৎ হবে ; সংঘ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মকানুনগুলি বাতিল হয়ে যাবে।

অস্টিন-প্রদত্ত সংজ্ঞা

১৮৩২ সালে প্রকাশিত *লেকচার্স অন্ জুরিসপ্রুডেন্স (Lectures on Jurisprudence)* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে ব্রিটিশ আইনবিদ **জন অস্টিন** (John Austin) সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব প্রচার করেন। ওই গ্রন্থে সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "**যখন কোনো সমাজে নির্দিষ্ট কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ) অপর কোনো অনুরূপ কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করেও সেই সমাজের অধিকাংশের স্বাভাবিক আনুগত্য লাভ করেন, তখন সেই নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেই সমাজে সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী বলে বিবেচিত হন এবং ওই কর্তৃপক্ষ-সহ এই সমাজ হল একটি স্বাধীন ও রাজনৈতিক সমাজ।**" এইভাবে অস্টিন **আইনকে অধস্তনের প্রতি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ** বলে বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক **ল্যাস্কির** মতে, অস্টিনের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের **তিনটি তাৎপর্য** রয়েছে, যথা—[১] রাষ্ট্র হল আইনানুসারে সংগঠিত এমন একটি সংস্থা, যেখানে নির্দিষ্ট কর্তৃত্বই হল সমগ্র ক্ষমতার উৎস ; [২] এরূপ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অসীম, অর্থাৎ কোনো কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং [৩] সার্বভৌম শক্তির আদেশই হল আইন। এইভাবে অস্টিন **সার্বভৌমিকতাকে বিশুদ্ধ আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ** করেছেন।

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতা

কিন্তু **মার্কসবাদীদের** দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতা **কেবল একটি আইনগত ধারণা নয়** ; তা হল **একটি রাজনীতিগত আইনি প্রত্যয়** (Politico-legal category)। তাই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সার্বভৌমিকতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যে-ব্যাখ্যাই প্রদান করুন না কেন, বাস্তবে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একদিকে যেমন রাষ্ট্রের শ্রেণি-চরিত্র নির্ধারণ করে দেয়, তেমনই আবার সেই **শ্রেণি-চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে সার্বভৌমিকতারও শ্রেণি-চরিত্র** গড়ে ওঠে। **মার্কসবাদীদের** মতে, রাষ্ট্র হল শ্রেণি-শাসনের হাতিয়ার। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যে-শ্রেণির প্রাধান্য বর্তমান থাকে, স্বাভাবিকভাবে সার্বভৌমিকতা সেই শ্রেণিরই করায়ত্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সামন্ত-সমাজে যেমন ভূস্বামীদের স্বার্থে, তেমনি বুর্জোয়া-সমাজে পুঁজিপতিদের স্বার্থে রাষ্ট্র-যন্ত্র কাজ করে। এরূপ **রাষ্ট্রকে চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন করা না হলে প্রচলিত শ্রেণি-সম্পর্ককে বজায় রাখা সম্ভব হবে না**। তাই রাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করে কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের প্রচারকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত শ্রেণির স্বার্থের পরিবর্তে সংখ্যালঘিষ্ঠ শোষক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। আইন হল সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছার প্রকাশ। তাই সার্বভৌম শক্তি যেহেতু শোষক শ্রেণি, সেহেতু তাদের **আইন কখনোই শোষিত শ্রেণির স্বার্থে প্রণীত হতে কিংবা তাদের স্বার্থরক্ষা করতে পারে না** বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন।

একত্ববাদী তত্ত্ব (Monistic Theory)

একত্ববাদ কী

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে আইনানুগ তত্ত্ব সাধারণভাবে একত্ববাদ বা একত্ববাদী তত্ত্ব নামে পরিচিত। অনেক সময় এই তত্ত্বকে 'সনাতন' বা 'সাবেকি' (traditional or classical) তত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়। যে-তত্ত্ব রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে **চরম, অবাধ, অসীম ও অবিভাজ্য** বলে প্রচার করে, তা একত্ববাদ নামে পরিচিত। কে. সি. সিয়াও (K. C. Hsiao) তাঁর *পলিটিক্যাল প্লুর্যালিজম্ (Political Pluralism)* নামক পুস্তকে 'একত্ববাদ' বলতে সেই তত্ত্বকে বোঝাতে চেয়েছেন, যা কর্তৃত্বের একটিমাত্র উৎসস্থলে বিশ্বাসী এবং যা সীমাহীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলে। **বোদাঁ, হবস্, বেন্থাম, অস্টিন** প্রমুখ হলেন এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা। অবশ্য কোকার (Coker) অস্টিনের মতো কেবল **'বৈশ্লেষিক আইনবিদদের'** (analytical jurists) **একত্ববাদী বলে চিহ্নিত করেছেন।** তবে একথা সত্য যে, উনবিংশ শতাব্দীতে **জন অস্টিন** সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বকে সর্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছিলেন।

মূল বক্তব্য

একত্ববাদের মূল বক্তব্য হল—[১] সার্বভৌমিকতা **রাষ্ট্রের অনন্য ক্ষমতা** অর্থাৎ কেবল রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কেউ এই ক্ষমতার অধিকারী নয়। [২] রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা প্রকৃতিগতভাবে **চরম, অবাধ, অসীম ও অবিভাজ্য**। [৩] সমাজ হল **'অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের একটি সংগঠন'** (an association of unassociated individuals)। [৪] **রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন।** [৫] রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের মধ্যে **সার্বভৌমের আদেশ বা নির্দেশই হল আইন।** কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংঘ বা প্রতিষ্ঠান সার্বভৌমের নির্দেশ, অর্থাৎ আইনকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করতে পারে না। লক্ষণীয় বিষয় হল—একত্ববাদীরা সার্বভৌমের নির্দেশকে আইন বলে চিহ্নিত করলেও কে সেই নির্দেশ প্রদানকারী, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে **যথেষ্ট মতপার্থক্য** রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মধ্যযুগে চার্চের নির্দেশকে আইন বলে মনে করা হলেও ষোড়শ শতাব্দীতে চার্চের সঙ্গে রাজার বিরোধ দেখা দিলে **বোদাঁ** এবং পরবর্তী সময়ে **হবস্ রাজার আদেশ বা নির্দেশকেই আইন** বলে চিহ্নিত করেছিলেন। [৬] কেবল **সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারীই** আইনের উৎস বলে বিবেচিত হওয়ায় তিনি তাঁর সৃষ্ট **আইনের ঊর্ধ্বে অবস্থান** করেন। আইন কোনোভাবেই তাঁর ওপর কোনোরূপ বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না।

একত্ববাদের শ্রেণি-বিভাগ

জে. ডি. ম্যাবোট (J. D. Mabbott) তাঁর *দ্য স্টেট অ্যান্ড দ্য সিটিজেন : অ্যান ইনট্রোডাকশন টু পলিটিক্যাল ফিলসফি (The State and the Citizen : an introduction to political philosophy)* নামক গ্রন্থে একত্ববাদকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—[ক] চরম একত্ববাদ (absolute monism) এবং [খ] বাস্তব একত্ববাদ (concrete monism)। **চরম একত্ববাদ** রাষ্ট্রকে এক ও অদ্বিতীয় বলে মনে করে। তাই এইরূপ একত্ববাদের প্রবক্তাগণ কেবল রাষ্ট্রের হাতে **সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত** বলে প্রচার করেন। তাঁরা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে-কোনো ধরনের সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলোপের পক্ষপাতী। কারণ, তাঁদের মতে, বিভিন্ন ধরনের সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকলে ব্যক্তির আনুগত্য লাভের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে। ফলে, মনুষ্য-জীবনের সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত বা বিপন্ন হবে। ফরাসি দার্শনিক **রুশো চরম একত্ববাদের প্রবক্তা** ছিলেন। কিন্তু **বাস্তব একত্ববাদের** সমর্থকরা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। তাই তাঁরা **রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার সংঘ এবং প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন না।** কিন্তু ওইসব সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের ওপর **চরম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা বিশেষ প্রয়োজন** বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের অভিমত হল—রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এই ধরনের সংঘ বা প্রতিষ্ঠান থাকলেও তারা কখনোই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে না ; কেবল রাষ্ট্রের হাতেই এরূপ ক্ষমতা অর্পিত থাকবে। বাস্তব একত্ববাদের প্রবক্তাগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, রাষ্ট্র সকলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারলেও তার ওপর কেউ কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে না। এমনকি, **ধর্মীয় অনুশাসন, প্রথা কিংবা আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সক্ষম নয়।**

বোদাঁর তত্ত্ব

ফরাসি দার্শনিক বোদাঁ (Bodin) তাঁর *সিক্স বুকস্ অন দ্য রিপাবলিক (Six Books on the Republic)* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, **সার্বভৌমিকতা হল 'নাগরিক ও প্রজাদের ওপর প্রযুক্ত আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত চূড়ান্ত ক্ষমতা'** (supreme power over citizens and subjects, unrestrained by law)। তিনি সার্বভৌমিকতাকে **চরম** (absolute), **চিরস্থায়ী** (perpetual) এবং **আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত** বলে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া, তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সার্বভৌম কর্তৃত্বই হল **আইনের উৎসস্থল**। তিনি **আইনকে 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নির্দেশ'** (command of the human superior) বলে বর্ণনা করেছেন। এরূপ আইনকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বলবৎ করা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে পোপের সঙ্গে রাজার বিরোধ শুরু হলে বোদাঁ রাজার কর্তৃত্বকে সমর্থন করেন। এমতাবস্থায় তিনি **রাষ্ট্রের পরিবর্তে রাজাকেই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী** বলে ঘোষণা করেছিলেন।

হবসের তত্ত্ব

বোদাঁর মতো ইংরেজ দার্শনিক **হবস্** তাঁর *লেভিয়াথান্* নামক পুস্তকে সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজশক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ তার দুর্বিষহ ও ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে **সব ক্ষমতা একজন মাত্র ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হাতে অর্পণ** করেছিল। পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই ব্যক্তি বা **ব্যক্তি-সংসদ হলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।** সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাজা চুক্তির পক্ষে ছিলেন না বলে তিনি চুক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থান করতেন, অর্থাৎ কোনোরকম শর্তাধীনে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হননি। তাই চুক্তিভঙ্গের অপরাধে কখনোই রাজা তথা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। এমনকি, **রাজা অত্যাচারী হয়ে উঠলেও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার জনসাধারণের থাকবে না** বলে হবস্ মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মতে, চুক্তিভঙ্গ করার অর্থই হল পুনরায় দুর্বিষহ ও ভয়াবহ প্রাকৃতিক অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তাই নিজেদের স্বার্থেই প্রজাদের চুক্তি মেনে চলার, অর্থাৎ রাজার প্রতি **দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রদর্শন** করার জন্য তিনি সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। বোদাঁর মতো হবস্ও **রাজার আদেশ বা নির্দেশকে আইন** বলে বর্ণনা করেছেন। এমনকি, তিনি এই অভিমতও ব্যক্ত করেছিলেন যে, নিজেদের কল্যাণের জন্য কতটুকু স্বাধীনতা প্রয়োজন, তা প্রজারা জানে না ; তা জানেন কেবল রাজা। তাই তিনি যতটুকু স্বাধীনতা প্রজাদের প্রয়োজন, ততটুকুই মাত্র প্রদান করেন। এইভাবে, বোদাঁর মতো হবস্ও সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তবে হবস্ সার্বভৌম শক্তির ওপর কোনোরূপ বিধিনিষেধ আরোপের সম্পূর্ণ বিরোধী হলেও বোদাঁ **সার্বভৌম শক্তির অধিকারী** [১] ঈশ্বরের আইন, [২] সাংবিধানিক আইন এবং [৩] ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার-সংক্রান্ত নিয়মাবলির অধীন বলে মন্তব্য করেছিলেন।

বেন্থামের তত্ত্ব হিতবাদী ইংরেজ দার্শনিক **বেন্থাম** সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তাঁর রচিত *এ ফ্র্যাগমেন্ট অন্ গভর্নমেন্ট (A Fragment on Government)* নামক গ্রন্থে সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আলোচিত হয়েছে। উপযোগিতার দিক থেকে রাষ্ট্রকে বিচারবিশ্লেষণ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে, **প্রাকৃতিক আইন, প্রাকৃতিক অধিকার প্রভৃতির দ্বারা রাষ্ট্র সীমাবদ্ধ নয়।** তিনি **স্বাভাবিক আইনের অস্তিত্বকে মানতে অস্বীকার করেছিলেন।** তিনি মনে করতেন যে, রাষ্ট্র যদি ভুল বা অন্যায় করে এবং জনসাধারণ যদি একথা উপলব্ধি করতে পারে যে, রাষ্ট্র ন্যায় অপেক্ষা অন্যায় বেশি করছে, তাহলে সেই **রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার নৈতিক অধিকার** জনগণের আছে।

অস্টিনের তত্ত্ব (Austin's Theory)

ব্রিটিশ আইনবিদ **জন অস্টিন** হলেন **আইনগত সার্বভৌমিকতার সর্বপ্রধান প্রবক্তা।** ১৮৩২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সুবিখ্যাত ও জনপ্রিয় দুটি গ্রন্থ *দ্য প্রভিন্স অব্ জুরিসপ্রুডেন্স ডিটারমিন্ড (The Province of Jurisprudence Determined)* এবং *লেকচার্স অন্ জুরিস্‌প্রুডেন্স (Lectures on Jurisprudence)*। কান্ট বা হেগেলের অধিবিদ্যামূলক দর্শনের দ্বারা তিনি প্রভাবিত না হলেও তাঁর ওপর হুগো (Hugo), হবস্ ও বেন্থামের চিন্তাধারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। হব্সের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের সঙ্গে বেন্থামের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের সমন্বয় সাধনের ফলশ্রুতি হল তাঁর একত্ববাদী তত্ত্ব।

সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে **অস্টিন** বলেছেন, যদি কোনো সমাজে নির্দিষ্ট কোনো **ঊর্ধ্বতন** মানবীয় **কর্তৃপক্ষ** অন্য কোনো **অনুরূপ কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করেও সেই সমাজের অধিকাংশ মানুষের স্বভাবগত আনুগত্য লাভ করে,** তাহলে **ওই নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হল সার্বভৌম এবং ওই কর্তৃপক্ষ-সহ** সমাজটি হল রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ। তিনি বিজ্ঞানসম্মত বিচারবিশ্লেষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, **আইন হল 'সার্বভৌমের নির্দেশ'** (the command of the Sovereign) মাত্র, অর্থাৎ তিনি আইনকে অধস্তনের প্রতি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ হিসেবে দেখেছিলেন। **আইনের পিছনে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অসীম ক্ষমতার সমর্থন** থাকে বলে কেউই তাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করতে পারে না। আইনের প্রকৃতি নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি আইনকে **সুনির্দিষ্ট এবং সার্বভৌম শক্তিকে তার উৎস** বলে বর্ণনা করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল—**স্বাভাবিক আইনের** ধারণাকে তিনি **'সংশয়পূর্ণ ও মিথ্যা' ধারণা** বলে মনে করতেন। আবার, তিনি রুশোর মতো 'সাধারণ ইচ্ছা' কিংবা লকের মতো নির্বাচকমণ্ডলীকে অথবা গ্রিনের মতো নৈতিক শক্তিকে আইনের এলাকায় প্রবেশ করার ছাড়পত্র দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁর মতে, **সার্বভৌমের এক্তিয়ারের মধ্যেই আইনের অবস্থান।**

বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features)

অস্টিন-প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে সার্বভৌমিকতার **কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য** প্রত্যক্ষ করা যায়। এগুলি হল:

[১] কেবল **স্বাধীন রাজনৈতিক সমাজেই সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব** বর্তমান থাকে।

[২] সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রকৃতিগতভাবে সব সময় **সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়ে** থাকে। কারণ, অস্টিন নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাই তা কখনোই জনসাধারণের মতো অনির্দিষ্ট কিংবা 'সাধারণ ইচ্ছা'র মতো নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে না।

[৩] সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হল দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তাই অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তাকে আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয় না। এদিক থেকে বিচার করে সার্বভৌম ক্ষমতাকে **চরম, অবাধ ও অসীম ক্ষমতা** বলে বর্ণনা করা যায়।

[৪] প্রকৃতিগতভাবে সার্বভৌম কর্তৃত্ব চরম ও অসীম হওয়ায় **যে-কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংঘ তার নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতে বাধ্য থাকে।** অন্যভাবে বলা যায়, নিজে কারো প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করলেও সার্বভৌম শক্তি সকলের কাছ থেকে আনুগত্য দাবি করে।

[৫] সার্বভৌম ক্ষমতা এক ও অবিভাজ্য। তাই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংঘ রাষ্ট্রের মতো সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়।

[৬] জনগণের **নিঃশর্ত ও স্বাভাবিক আনুগত্যই** হল সার্বভৌমিকতার **ভিত্তি**। সার্বভৌম শক্তির উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে বলেই জনসাধারণ স্বেচ্ছায় তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে।

[৭] সার্বভৌমিকতা **অ-হস্তান্তরযোগ্য**, অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি- সংসদ তাঁর বা তাঁদের এই চরম ক্ষমতাকে অন্য কোনো মানবীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে পারেন না।

[৮] সার্বভৌম শক্তির **আদেশ বা নির্দেশই হল আইন**। তাই সবাইকে আইন মেনে চলতে হয়। কেউই আইনের উর্ধ্বে অবস্থান করে না। আইন অমান্য করলে শাস্তি পেতে হয়।

[৯] রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকলের ওপর **সমানভাবে সার্বভৌমিকতা প্রযুক্ত** হয়।

ল্যাস্কির অভিমত

অধ্যাপক **ল্যাস্কির** মতে, অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের **তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য** লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল —[ক] অস্টিন রাষ্ট্রকে এমন **'একটি আইনগত ব্যবস্থা'** (a legal order) বলে বর্ণনা করেছেন, যেখানে নির্দিষ্ট কর্তৃত্বই হল সমগ্র ক্ষমতার উৎসস্থল। [খ] এইরূপ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব চরম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তা **কোনোকিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত নয়**। [গ] সার্বভৌমের **আদেশই হল আইন** এবং আইনভঙ্গের অপরাধে রাষ্ট্র আইনভঙ্গকারীকে যথোচিত শাস্তি দেওয়ার অধিকারী।

সমালোচনা (Criticism)

নানা দিক থেকে অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের সমালোচনা করা যেতে পারে:

রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা উপেক্ষিত

[১] অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব হল একটি বিশুদ্ধ আইনগত তত্ত্ব। তিনি **কেবল আইনগত সার্বভৌমিকতাকে স্বীকৃতি** দিয়েছেন। ফলে তাঁর তত্ত্বে **রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত** হয়েছে। আইনগত সার্বভৌমিকতার পিছনে রাষ্ট্রের যে-সমষ্টিগত প্রভাব বর্তমান, তার ঐক্যবদ্ধ রূপকে গিলক্রিস্ট রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলে অভিহিত করেছেন। সাধারণভাবে নির্বাচকমণ্ডলী এবং জনমত গঠনকারী বিভিন্ন প্রভাবের সমষ্টিকে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলা হয়। আইনগত সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী কখনোই রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অস্টিন ব্রিটেনের রাজা বা রানি-সহ পার্লামেন্টকে সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই সর্বশক্তিমান আইনগত সার্বভৌমও জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাস্তবে কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে না। আর তা করা হলে ব্যাপক **গণ-বিক্ষোভের জোয়ারে** পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে। সুতরাং, অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব **বাস্তবতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিহীন**। এইভাবে আইনগত সার্বভৌমিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্য অনেকে অস্টিনকে **একদেশদর্শী ও সংকীর্ণ তত্ত্বের প্রবক্তা** বলে সমালোচনা করেন।

সার্বভৌমের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক-সংক্রান্ত ধারণা ভ্রান্ত

[২] **অস্টিনের** মতে, নির্দেশদানকারী সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ এবং নির্দেশ মান্যকারী জনসাধারণকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। এর অর্থ—**সার্বভৌমের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক হল অধীনতার সম্পর্ক**। কিন্তু এরূপ **ধারণাকে কখনোই সমর্থন করা যায় না**। কারণ, সার্বভৌম কর্তৃত্ব, অর্থাৎ **রাষ্ট্র কখনো 'নিজেই নিজের লক্ষ্য' হতে পারে না** ; তা নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার মাত্র। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবক্তারা রাষ্ট্রকে জনকল্যাণ সাধনের মাধ্যম এবং মার্কসবাদীরা শ্রেণি-শাসনের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেন। লক্ষণীয় বিষয় হল—রাষ্ট্রের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে উদারনীতিবাদীদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকলেও রাষ্ট্র যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র মাত্র, সে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোনোরকম মতবিরোধ নেই।

যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় অসম্ভব

[৩] অস্টিন সার্বভৌম শক্তিকে **সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ** হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু হেনরি মেইন (Henry Maine) **এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের মধ্যে সব সময় সার্বভৌমিকতার অবস্থান লক্ষ** করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে অধ্যাপক ল্যাস্কি **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কথা উল্লেখ**

করেছেন। এখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা বণ্টিত হয়। তা ছাড়া, উভয় প্রকার সরকারই সংবিধানের গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ করতে বাধ্য থাকে। তাই অনেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানকে সার্বভৌম বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু এই যুক্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানেরও পরিবর্তন সাধন করা যায়। তাই কেউ কেউ সংবিধান-পরিবর্তনকারী সংস্থাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেন। কিন্তু কোন্ সংস্থা সংবিধান সংশোধনের অধিকারী, তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যথেষ্ট কঠিন। এইসব দিক থেকে বিচার করে একথা বলা যেতে পারে যে, **যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা আদৌ সম্ভব নয়।**

সার্বভৌমিকতা অবাধ ও চরম নয়

[৪] অস্টিন সার্বভৌম ক্ষমতাকে **চরম, অবাধ ও অসীম** বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু **বাস্তবে এরূপ সার্বভৌমিকতার অবস্থিতি লক্ষ করা যায় না।** আপাতদৃষ্টিতে স্বৈরাচারী শাসকের ক্ষমতাকে চরম, অবাধ ও অসীম বলে মনে হলেও বাস্তবে তিনি যা খুশি তা-ই করতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক **ল্যাস্কি** বলেছেন, 'স্বৈরাচারী জার' পেট্রোগ্রাদের 'শীত প্রাসাদে'র সামনে প্রজাদের গুলি করে হত্যা করতে পারলেও সেজন্য প্রজারা তাঁকে নিশ্চিতভাবেই ধিক্কার জানাবেন। বস্তুত, যে-কোনো নরপতি তাঁর **চরম সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে তাঁর বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ, এমনকি বিদ্রোহও দেখা দিতে পারে।** সুতরাং বলা যায়, তত্ত্বগতভাবে সার্বভৌম অবাধ, অসীম ও চরম ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে তার বিপরীত চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়।

আইনের প্রকৃতি-সংক্রান্ত ধারণাও ভ্রান্ত

[৫] অস্টিন **আইনকে 'সার্বভৌম শক্তির আদেশ' বলে বর্ণনা করে সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, লোকাচার প্রভৃতির গুরুত্বকে অস্বীকার** করেছেন বলে সমালোচকদের অভিযোগ। সার্বভৌম শক্তির আদেশ না হলেও এগুলি **সমাজ-জীবনের ওপর আইনের মতোই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।** এমনকি, স্বয়ং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীও এগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **ল্যাস্কি** বলেছেন যে, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তুরস্কের সুলতানের পক্ষেও প্রথাগত বিধিনিষেধগুলিকে উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। **হেনরী মেইনের** মতে, প্রাচ্যের অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিতে প্রথাগত বিধিনিষেধের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত প্রবল। উদাহরণ হিসেবে তিনি **পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিং**-এর কথা বলেছেন। তিনি সারাজীবনে এমন একটিও আদেশ জারি করেননি, যেটিকে অস্টিন আইন বলে অভিহিত করতে পারেন।

আইনের উৎস-সংক্রান্ত ধারণাও ভুল

[৬] অস্টিন-প্রদত্ত সংজ্ঞায় কেবল **সার্বভৌমকে আইনের উৎস** বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু **এই ধারণা সত্য নয়।** কারণ, সার্বভৌম শক্তি সব ধরনের আইনের উৎস বলে বিবেচিত হয় না। উদাহরণ হিসেবে **ব্রিটেনের 'সাধারণ আইন'** (common law)-এর কথা বলা যেতে পারে। বিচারালয়ের রায় থেকেই এই ধরনের আইনের উৎপত্তি ঘটেছে। আবার, **আইনের একাধিক উৎসও** রয়েছে। প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের রায়, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা প্রভৃতিকে অধ্যাপক **হল্যান্ড** আইনের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আইন মান্য করার কারণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

[৭] অস্টিন এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, **লোকে শাস্তির ভয়ে আইন** মান্য করে। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ করলে এই বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। **দ্যুগুই**-এর মতে, **সামাজিক সংহতির জন্য** প্রয়োজন বলেই লোকে আইন মান্য করে ; রাষ্ট্রের দ্বারা প্রণীত হয়েছে বলে নয়। **লর্ড ব্রাইস** আইনের প্রতি **আনুগত্য প্রদর্শনের পাঁচটি প্রধান কারণ** রয়েছে বলে মনে করেন। এগুলি হল—**[i]** নির্লিপ্ততা, **[ii]** শ্রদ্ধা, **[iii]** সহানুভূতি, **[iv]** শাস্তির ভয় এবং **[v]** আইনের যৌক্তিকতার উপলব্ধি। সুতরাং বলা যায়, অস্টিন আইন মেনে চলার **অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণকেই একমাত্র কারণ বলে চিহ্নিত করে ভুল করেছেন।**

'আদেশ তত্ত্ব' গ্রহণযোগ্য নয়

[৮] 'আইন হল সার্বভৌমের আদেশ'—একথা বলে অস্টিন **আইনের 'আদেশ তত্ত্ব'** (command theory) প্রচার করেছেন। 'আদেশ' বলতে কোনোকিছু করা বা না-করাকে বোঝায়। এদিক থেকে বিচার করে **আইনকে 'কর্তব্য-নির্দেশক'** বলে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু **সব আইন 'কর্তব্য-নির্দেশক' নয়।** উদাহরণ হিসেবে উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ আইন প্রভৃতির মতো দেওয়ানি আইনের কথা বলা যেতে পারে।

অগণতান্ত্রিক মতবাদ

[৯] অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব **গণতন্ত্রের পরিপন্থী**। কারণ, গণতন্ত্রে ব্যক্তি তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ লাভ করে। কিন্তু অস্টিন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে সব কিছুর, এমনকি আইনের ঊর্ধ্বেও স্থাপন করেছেন। ফলে সার্বভৌমের সঙ্গে জনসাধারণের **সম্পর্ক কার্যত, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে পরিণত হয়**। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে, **গণতন্ত্রে প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হল জনগণ**। তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকারকে চূড়ান্তভাবে তাদের কাছেই দায়িত্বশীল থাকতে হয়। কিন্তু অস্টিনের সার্বভৌম সর্বপ্রকার দায়িত্বশীলতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। এই ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবেই **গণতন্ত্রের বিরোধী**।

বহুত্ববাদীদের সমালোচনা

[১০] বহুত্ববাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে অস্টিনের একত্ববাদী তত্ত্বের **কঠোর সমালোচনা** করেছেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র ছাড়াও সমাজের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি **নানা ধরনের সংঘ, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান** থাকে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাজে এগুলি রাষ্ট্রের মতোই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাভাবিক কারণে ওইসব সংঘ, গোষ্ঠী বা সংগঠন **রাষ্ট্রের মতোই জনসাধারণের আনুগত্য দাবি করতে পারে**। তাই অধ্যাপক ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন যে, মানুষের আনুগত্য যেহেতু বহুমুখী, সেহেতু রাষ্ট্র কখনোই এককভাবে চরম সার্বভৌমিকতা দাবি করতে পারে না। তা ছাড়া, এগুলি **নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম**। তাই ল্যাস্কি বলেছেন যে, প্রকৃতিগতভাবে কর্তৃত্ব (authority) হল যুক্তরাষ্ট্রীয়।

আন্তর্জাতিকতা-বাদীদের সমালোচনা

[১১] **আন্তর্জাতিকতাবাদীগণ** অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের **সমালোচনা** করে একথা বলেন যে, **বর্তমান বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রই চরম সার্বভৌমিকতার অধিকারী নয়**। কারণ, প্রতিটি রাষ্ট্রকেই **আন্তর্জাতিক আইন** মেনে চলতে হয়। তা ছাড়া, যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহ **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ** নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। বলা বাহুল্য, এই সংস্থার **আইন, নির্দেশ প্রভৃতি সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে মেনে চলতে হয়**। তাই বর্তমানে কোনো রাষ্ট্রই অস্টিনের তত্ত্ব অনুযায়ী সার্বভৌম নয়। কারণ, তাদের চরম বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার অবসান ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক **ল্যাস্কি** বলেছেন যে, বাহ্যিক দিক থেকে একটি চরম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের ধারণা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী। তাঁর মতে, সার্বভৌমিকতা-সংক্রান্ত যাবতীয় ধারণাকে পরিত্যাগ করতে পারলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মঙ্গল হত।

প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব

[১২] **মার্কসবাদীরা** অস্টিন প্রমুখ একত্ববাদীদের প্রচারিত আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা তত্ত্বকে **প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব** বলে মনে করেন। কারণ, তাঁরা যে-সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কথা বলেছেন, সেই কর্তৃপক্ষ সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হয়। উদাহরণ হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কথা বলা যেতে পারে। অস্টিন একে সার্বভৌম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু **মার্কসবাদীদের** মতে, ধনবৈষম্যমূলক সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণি পার্লামেন্টে নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদেরই প্রেরণ করে। এরূপ **বুর্জোয়া পার্লামেন্ট কখনোই জনস্বার্থে আইন প্রণয়ন করতে পারে না**। বলা বাহুল্য, এরূপ পার্লামেন্টকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করা হলে কেবল বুর্জোয়াদেরই স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং প্রচলিত সম্পত্তি-সম্পর্ক বজায় থাকবে।

উপসংহার

অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের নানা প্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও **গার্নার** এটিকে **সুস্পষ্ট ও যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্ব** বলে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া, সিজউইক, ল্যাস্কি প্রমুখ সার্বভৌমিকতা ও পাশবিক শক্তিকে অভিন্ন করে দেখার জন্য অস্টিনের কঠোর সমালোচনা করলেও **কোকার** এই অভিযোগ মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। **ফ্রান্সিস গ্রাহাম উইলসনও** অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, অস্টিন এমন অর্বাচীন ছিলেন না যে, তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে সরকারি স্বেচ্ছাচারের সমার্থক হিসেবে গণ্য করবেন। এতদসত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, **রাজনৈতিক ও জনগণের সার্বভৌমিকতাকে উপেক্ষা** করে অস্টিন কেবল আইনসংগত সার্বভৌমিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে যে-একত্ববাদী তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তা **অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট**।

বহুত্ববাদী তত্ত্ব (Pluralistic Theory)

একটি প্রতিবাদী বৌদ্ধিক আন্দোলন

বহুত্ববাদ হল সার্বভৌমিকতার **একত্ববাদী তত্ত্ব-বিরোধী একটি বৌদ্ধিক আন্দোলন** (an intellectual movement)। উনিশ শতকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওই সময় জৈব মতবাদ, হিতবাদ, আদর্শবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতির মতো রাষ্ট্রদর্শন **রাষ্ট্রের ক্ষমতা-বৃদ্ধির সপক্ষে নানারকম যুক্তিতর্কের অবতারণা** করে। এর বিরুদ্ধে **প্রতিক্রিয়া হিসেবে বহুত্ববাদের আবির্ভাব** ঘটে। অবশ্য কোকার বহুত্ববাদের উৎপত্তির এইসব কারণকে **গৌণ কারণ** হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, **সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে অনমনীয় আইনগত বিশ্লেষণের প্রতিবাদী আন্দোলন** হিসেবে বহুত্ববাদের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **গিয়ার্কে** এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **মেট্‌ল্যান্ড** বহুত্ববাদী তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করেন। পরবর্তী সময়ে, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক চিন্তাজগতে তা আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বহুত্ববাদের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে ব্রিটেনের **ওয়েব দম্পতি, কোল, ল্যাস্কি, লিন্ডসে, ফিগিস ও বার্কার**; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **ফোলেট** (Follet) ও **ম্যাকআইভার** এবং ফ্রান্সের **দ্যুগুই** প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বহুত্ববাদ কী

যে-তত্ত্ব রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে চরম, অবাধ, অসীম ও অবিভাজ্য বলে মনে করার পরিবর্তে একথা প্রচার করে যে, **রাষ্ট্রের মতোই সমাজের বিভিন্ন সংঘ বা গোষ্ঠী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী**, তা সাধারণভাবে **বহুত্ববাদ** নামে পরিচিত। এই মতবাদের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করেন না। কিন্তু **চরম বহুত্ববাদীরা নৈরাজ্যবাদীদের মতো রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের পক্ষপাতী** বলে অনেকের অভিমত। এঁরা **রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য সমাজের বিভিন্ন সংঘ ও গোষ্ঠীর হাতে** অর্পণ করতে বিশেষ আগ্রহী। অবশ্য একথা সত্য যে, বহুত্ববাদের অধিকাংশ প্রবক্তাই **রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন পর্যন্ত** অগ্রসর **হওয়ার পক্ষপাতী নন**। তাঁরা বড়ো জোর **সংঘমূলক সমাজতন্ত্র** (Guild Socialism) কিংবা **শ্রমিক সংঘবাদ** (Syndicalism) **প্রতিষ্ঠার কথা** বলেন। অন্যভাবে বলা যায়, **বহুত্ববাদীরা নৈরাজ্যবাদীদের মতো রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের পরিবর্তে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বিলোপ সাধনের পক্ষপাতী**। ম্যাবোটের মতে, বহুত্ববাদ রাষ্ট্রকে এমন একটি বিশেষ সংস্থা বলে মনে করে, যার কোনো উচ্চতর মূল্য (value) বা মর্যাদা নেই। **সিয়াও** অত্যন্ত সংগতভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, বহুত্ববাদী রাষ্ট্রে চরম ও সর্বব্যাপী কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনো বিশেষ কর্তৃপক্ষ, 'সমন্বিত আইনব্যবস্থা' (unified system of law), কেন্দ্রীভূত প্রশাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতির কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

অধ্যাপক **গেটেলকে** অনুসরণ করে বহুত্ববাদের **প্রধান প্রতিপাদ্য** বিষয়কে **কয়েকটি ভাগে** ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। [১] বহুত্ববাদ রাষ্ট্রকে 'একটি অদ্বিতীয় সংস্থা' (an unique organisation) বলে মনে করে না। [২] বহুত্ববাদীদের মতে, সমাজের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের সংস্থা রাষ্ট্রের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ও স্বাভাবিক (equally important and natural)। [৩] লক্ষ্যগত ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেমন সার্বভৌম, সমাজের অন্যান্য সংস্থাও তেমনি সার্বভৌম। [৪] রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিরোধিতা সত্ত্বেও রাষ্ট্র তার ইচ্ছাকে জোর করে তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। [৫] বহুত্ববাদীরা একথা মানতে রাজি নন যে, রাষ্ট্রের হাতে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা থাকায় তা অন্যান্য সংঘ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জনগণের আনুগত্য দাবি করার অধিকারী। [৬] রাষ্ট্রের মতো সমাজের বিভিন্ন সংস্থা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে বলে বহুত্ববাদীদের ধারণা। [৭] রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো অর্থেই অবিভাজ্য (indivisible), অসীম (unlimited) ও চূড়ান্ত নয়।

বহুত্ববাদীগণ কর্তৃক একত্ববাদের সমালোচনা (Criticism of Monism by the Pluralists)

বহুত্ববাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আইনবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা প্রধানত যে **তিনটি দিক** থেকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার **একত্ববাদী তত্ত্বের সমালোচনা** করেন, সেগুলি হল—[ক] সামাজিক কাঠামোর দিক, [খ] আইনগত দিক এবং [গ] আন্তর্জাতিক সমাজ ও আইনের দিক।

[ক] ***সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে সমালোচনা :*** বোদাঁ, হবস্, বেন্থাম, অস্টিন প্রমুখ একত্ববাদী রাজা বা রাষ্ট্রকে এককভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা হল চরম, চিরস্থায়ী, অসীম ও আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত। তাই তার প্রতি **দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রদর্শন করতে প্রতিটি ব্যক্তি, সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকে।** কিন্তু বহুত্ববাদীরা এই যুক্তি মেনে নিতে রাজি নন। **সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁরা একত্ববাদের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি প্রদর্শন** করেন, সেগুলি হল:

সামাজিক কাঠামোর ধ্বংস সাধন

[১] কেবল রাষ্ট্রকে নিয়েই সমাজ গঠিত হয় না। সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র ছাড়াও নানা ধরনের সংঘ, সংগঠন, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান থাকে। **মানুষের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করা কেবল রাষ্ট্রের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।** তাই মানুষ **অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও পেশাগত বিভিন্ন সংঘ, গোষ্ঠী, সংগঠন** প্রভৃতির সদস্যপদ গ্রহণ এবং তাদের প্রতি স্বেচ্ছায় আনুগত্য প্রদর্শন করে। বহুত্ববাদীদের মতে, এইসব সংঘ, গোষ্ঠী প্রভৃতি **রাষ্ট্রের মতোই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।** কিন্তু একত্ববাদীরা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের হাতে চরম ও অসীম সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করে ওইসব সংঘ, গোষ্ঠী প্রভৃতিকে রাষ্ট্রের অধীনে স্থাপন করে **কার্যত, সামাজিক কাঠামোর ধ্বংস সাধনে** আত্মনিয়োগ করেছেন।

অন্তর্জীবনের বিকাশে রাষ্ট্রের অক্ষমতা

[২] একত্ববাদ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সর্বব্যাপী বলে বর্ণনা করে। কিন্তু বহুত্ববাদীরা এই মতের সমালোচনা করে বলেন যে, **কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কখনোই সর্বব্যাপী ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না।** উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, **রাষ্ট্র** ব্যক্তির বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও তা **মানুষের অন্তর্জীবনের ওপর কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নয়।** এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **ম্যাকআইভার** বলেছেন যে, পেনসিল কাটার পক্ষে কুঠার যেমন অনুপযোগী, ব্যক্তির অন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির বিকাশসাধনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রও তেমনি অনুপযোগী।

সমাজ অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-সমূহের একটি সংগঠন নয়

[৩] **একত্ববাদীরা** সমাজকে **'অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের সংগঠন'** (association of unassociated individuals) বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু **বহুত্ববাদীরা** এই অভিমত মেনে নিতে রাজি নন। তাঁদের মতে, **মানুষ** যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব, সেহেতু **নিজেদের প্রয়োজনেই** তারা **পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমাজ গঠন** করেছিল। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **ল্যাস্কি** বলেছেন যে, লক্ষ্য পূরণের জন্য মানুষ পরিবেশের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম-মনোভাবাপন্ন মানুষের সঙ্গে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। তাঁর মতে, সমাজ-জীবন হল প্রকৃতপক্ষে সেইসব সংঘ ও সংগঠনের সম্মিলিত রূপ, যেগুলির মাধ্যমে ব্যক্তি-মানুষ নিজেদের সংগঠিত করে আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হতে পারে। **আর্নেস্ট বার্কার** তাঁর *পলিটিক্যাল থট্ ইন ইংল্যান্ড ফ্রম হার্বার্ট স্পেনসার টু দ্য প্রেজেন্ট ডে (Political Thought in England from Herbert Spencer to the Present Day)* নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, রাষ্ট্র ব্যক্তিসমূহের একটি সংগঠনের থেকেও বেশি কিছু। কারণ, সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী গঠন করে নিজেদের সংগঠিত করেছে। এর অর্থ— **রাষ্ট্র হল মানুষের বিভিন্ন প্রকার সংঘের মধ্যে অন্যতম সংঘ** মাত্র। তাই **অন্যান্য সংঘের তুলনায় তা মানুষের অধিক আনুগত্য কখনোই দাবি করতে পারে না।** এইসব কারণে **ল্যাস্কি** প্রমুখ বহুত্ববাদী সমাজকে **'সংঘমূলক'** বলে বর্ণনা করেছেন।

বিভিন্ন সংঘ, গোষ্ঠী প্রভৃতি স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট ও যৌথ চেতনাসম্পন্ন

[৪] একত্ববাদ সমাজের মধ্যে অবস্থিত **বিভিন্ন সংঘ, গোষ্ঠী প্রভৃতির** গুরুত্বকে অস্বীকার করলেও বহুত্ববাদীরা সেগুলিকে **স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট এবং 'যৌথ চেতনাসম্পন্ন'** বলে মনে করেন। **গিয়ার্কে ও মেটল্যান্ডের** মতে, স্বাধীন সত্তা, চেতনা ও ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট স্থায়ী সংঘগুলি স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে। অনুরূপভাবে, **ফিগিস** গোষ্ঠীসমূহকে 'প্রকৃত ব্যক্তিত্ব' (real personality)-এর অধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, **'ব্যক্তির মতো সংঘগুলিও আত্মবিকাশ'** (self-development like a person) **ঘটাতে সক্ষম।** উদাহরণ হিসেবে তিনি চার্চ, ট্রেড ইউনিয়ন, পরিবার প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং **রাষ্ট্র কোনোমতেই ওইসব সংঘ, গোষ্ঠী প্রভৃতির ওপর সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।** ব্যক্তির মতো তাদেরও কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে এবং রাষ্ট্রের উচিত ওইসব অধিকার ও কর্তব্যকে স্বীকার করে নেওয়া। এইসব কারণে **ফিগিস** সার্বভৌমিকতার সাবেকি তত্ত্বকে **'একটি প্রাচীন কুসংস্কার'** (a venerable superstition) বলে বর্ণনা করেছেন।

রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উৎপত্তি

[৫] একত্ববাদীদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের সমালোচনা করে বহুত্ববাদীরা একথা বলেন যে, সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র ছাড়াও যেসব নানা ধরনের সংঘ রয়েছে, সেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয়নি। গিয়ার্কে ও মেটল্যান্ডের মতে, ওইসব সংঘ সামাজিক প্রয়োজনে স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে। এমনকি, রাষ্ট্রের বহু পূর্বেই ওইসব সংঘের উৎপত্তি ঘটেছে। স্বাভাবিক কারণে এগুলির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ। তাই রাষ্ট্র কখনোই এদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বরং, তাদের কার্যাবলির মধ্যে কেবল **সমন্বয় সাধনের জন্যই রাষ্ট্রের অবস্থিতি প্রয়োজন** বলে ল্যাস্কি মনে করেন।

রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন নয়

[৬] একত্ববাদীরা রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন মনে করেন বলেই রাষ্ট্রকে সবকিছুর ওপর স্থান দিয়েছেন। কিন্তু বহুত্ববাদীরা **রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান** বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, **সমাজের পরিধি রাষ্ট্রের পরিধি অপেক্ষা অনেক বেশি** ব্যাপক। তা ছাড়া, **রাষ্ট্রের উৎপত্তির বহু পূর্ব থেকেই সমাজের অস্তিত্ব** ছিল। সর্বোপরি, **রাষ্ট্র মানুষের কেবল বাহ্যিক আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ** করে। কিন্তু **সমাজ** মানুষের বাহ্যিক, মানসিক, নৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি **সমগ্র জীবনকেই নিয়ন্ত্রণ** করতে সমর্থ। তাই **ম্যাকআইভার** মন্তব্য করেছেন যে, রাষ্ট্রকে সমাজ এবং সমাজকে রাষ্ট্র বলে মনে করলে ভুল করা হবে। **বার্কারের** মতে, সমাজ ও রাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হলেও এরা একই কাজ একসঙ্গে করে না।

একটি অন্তঃসারশূন্য ধারণা

[৭] কোল, হবসন (Hobson) প্রমুখ সংঘমূলক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা **রাষ্ট্রকে মনুষ্য-সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান** বলে মনে করেন। তাই তাঁরা **রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার মানুষের হাতেই অর্পণ** করার পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য, নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যই মানুষ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল। অনুরূপভাবে, অন্যান্য উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, পেশাগত প্রভৃতি সংঘ, গোষ্ঠী বা সংগঠন গড়ে তুলেছিল। এদিক থেকে বিচার করলে **রাষ্ট্রকে কোনোমতেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করা যায় না।** তাই **ম্যাকআইভার** রাষ্ট্রকে 'একটি বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান' বলে বর্ণনা করলেও তাকে 'একটি অসাধারণ' বা অনন্য-সাধারণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সম্মত নন। ল্যাস্কি রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমিকতাকে **'একটি অন্তঃসারশূন্য ধারণা'** হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আনুগত্যের নৈতিক ভিত্তি উপেক্ষিত

[৮] একত্ববাদীরা আইনগত দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য ব্যক্তিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু বহুত্ববাদীরা **নৈতিকতার মানদণ্ডে আনুগত্যের প্রশ্নটিকে বিচার-বিবেচনা** করার পক্ষপাতী। এ বিষয়ে অধ্যাপক **ল্যাস্কির** অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, বিবেক (conscience)-এর দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোনো আনুগত্য রাষ্ট্র দাবি করতে পারে না। মানুষের বিবেক রাষ্ট্র-কর্তৃত্বকে যতখানি মান্য করার নির্দেশ দেবে, ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রতি ততখানিই মাত্র আনুগত্য প্রদর্শন করবে। তাঁর ভাষায়, "আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হল আমাদের বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া" (to be true to our conscience)। এর অর্থ— যে-রাষ্ট্র ন্যায়নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে ব্যক্তি বাধ্য নয়। **আনুগত্য প্রদর্শনের এরূপ নৈতিক ভিত্তিকে উপেক্ষা করার জন্য বহুত্ববাদীরা একত্ববাদের সমালোচনা করেন।**

রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্যহীনতা

[৯] একত্ববাদীরা রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। কিন্তু বহুত্ববাদীরা এরূপ পার্থক্য নির্ণয়কে **'আইনগত যুক্তির একটি কৃত্রিম ফল'** (an artificial product of legal reasoning) বলে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। **দ্যুগুই**-এর মতে, বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করলে আইনগত যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়। **রাষ্ট্রের ধারণা হল একটি বিমূর্ত ধারণা। সরকারের মাধ্যমে সেই ধারণা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ** করে। ল্যাস্কিও রাষ্ট্র বলতে সরকারকেই বোঝায় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব-সংক্রান্ত আইনগত তত্ত্বকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আবার, সাম্প্রতিককালে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রের পরিবর্তে **'রাজনৈতিক ব্যবস্থা'র আলোচনা ও বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব** আরোপ করেছেন। এমনকি, প্রতিটি মনুষ্য-সংঘের একটি করে রাজনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে বলে **রবার্ট ডাল** মনে করেন। তাঁর প্রদত্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞায় পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

[খ] *আইনগত দিক থেকে সমালোচনা :* একত্ববাদের আইন-সংক্রান্ত ধারণাকে বহুত্ববাদীরা যেসব কারণে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল:

সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতিকে উপেক্ষা

[১] একত্ববাদীরা সার্বভৌম শক্তির আদেশ বা নির্দেশকে আইন বলে প্রচার করেন। বহুত্ববাদীদের মতে, এরূপ প্রচার করে একত্ববাদীরা **সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, লোকাচার প্রভৃতির** গুরুত্বকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন। অথচ **সার্বভৌমের আদেশ বা নির্দেশ না হওয়া সত্ত্বেও সমাজ-জীবনের ওপর আইনের মতোই** এগুলির প্রভাব বর্তমান। এমনকি, সার্বভৌম শক্তি নিজেও এগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই **ল্যাস্কি** বলেছেন, পরম পরাক্রমশালী তুরস্কের সুলতানের পক্ষেও প্রথাগত বিধিনিষেধগুলিকে উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল।

আইনের উৎস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

[২] অস্টিন প্রমুখ একত্ববাদী কর্তৃক প্রদত্ত সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁরা কেবল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে আইনের উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বহুত্ববাদীরা এরূপ বক্তব্যকে ভ্রান্ত বলে সমালোচনা করেন। কারণ, **আইনের একাধিক উৎস** রয়েছে, যথা—প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের রায় ইত্যাদি। **দ্যুগুই** এই বিষয়টিকে 'আইনগত বিকেন্দ্রীকরণ' (legal decentralisation) বলে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া, এমন কতকগুলি আইন রয়েছে, যাদের উৎসস্থল রাষ্ট্র নয়। উদাহরণ হিসেবে ব্রিটেনের 'সাধারণ আইন'-এর কথা বলা যেতে পারে। বিচারালয়ের রায় থেকেই এই ধরনের আইনের উৎপত্তি ঘটেছে।

আইনের একত্ববাদী সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ

[৩] **একত্ববাদীরা কেবল রাষ্ট্রীয় আইনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে অন্যান্য আইনকে উপেক্ষা** করেছেন বলে বহুত্ববাদীরা তাঁদের সমালোচনা করেন। এইসব আইনের মধ্যে নৈতিক আইন, প্রাকৃতিক আইন (natural law) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব আইনও মানুষ ও তার সমাজ-জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম। তা ছাড়া, অস্টিন প্রমুখ আইনকে সার্বভৌমের 'আদেশ' (command) বলে বর্ণনা করেছেন। বহুত্ববাদীদের মতে, **'আইন' ও 'আদেশ' অভিন্ন নয়। 'আদেশ'** বলতে শাসনকার্য পরিচালনাকে বোঝায়, আইন প্রণয়নকে নয়। যদি তর্কের খাতিরে সার্বভৌমের 'আদেশ'কে 'আইন' বলে ধরেও নেওয়া যায়, তাহলে প্রকৃতিগত দিক থেকে **'আইন'কে 'কর্তব্য নির্দেশক'** হিসেবে গণ্য করতে হয়। কিন্তু এমন **অনেক আইন রয়েছে, যেগুলি আদৌ 'কর্তব্য নির্দেশক' নয়।** উদাহরণ হিসেবে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত আইন, বিবাহ-সংক্রান্ত আইন প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্বৈরাচারিতার পথ প্রশস্ত করা

[৪] সার্বভৌম যেহেতু আইনের একমাত্র উৎস, সেহেতু **একত্ববাদীরা সার্বভৌমকে আইনের ঊর্ধ্বে স্থাপন** করেন। কিন্তু **বহুত্ববাদীরা** এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে একথা বলেন যে, **রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার অর্থই হল স্বৈরাচারিতার পথ প্রশস্ত** করা। তাই **দ্যুগুই, ক্র্যাবে** প্রমুখ রাষ্ট্রের পরিবর্তে আইনকেই সার্বভৌম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সরকার প্রণীত আইন কখনোই চরম ও চূড়ান্ত নয়

[৫] একত্ববাদীরা রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়নকারী ও আইন বলবৎকারী সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু বহুত্ববাদীদের মতে, **একত্ববাদীরা রাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারের পার্থক্য নিরূপণ করে ভুল** করেছেন। রাষ্ট্রের বিমূর্ত ধারণা সরকারের মাধ্যমেই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। তাই রাষ্ট্রের **আইনগত সার্বভৌমিকতা কার্যক্ষেত্রে সরকারের সার্বভৌমিকতায় রূপান্তরিত** হয়। কিন্তু সরকার যেহেতু মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত, সেহেতু তাদের প্রণীত আইন কখনোই চরম, চূড়ান্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী হতে পারে না। এইসব কারণে বহুত্ববাদীরা সরকার তথা রাষ্ট্রের হাতেই কেবল **আইন প্রণয়নের ক্ষমতা** প্রদান না করে সমাজের **বিভিন্ন প্রকার সংঘ, গোষ্ঠী, সংগঠন প্রভৃতির হাতে** তা প্রদান করার পক্ষপাতী।

আইন মান্যের কারণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

[৬] অস্টিন প্রমুখ একত্ববাদীর মতে, লোকে **শাস্তির ভয়েই রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে।** কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে **বহুত্ববাদীরা এই যুক্তিকে আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিতে সম্মত নন। দ্যুগুই**-এর মতে, সামাজিক সংহতির জন্য প্রয়োজন বলেই মানুষ আইন মেনে চলে ; রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত হয়েছে বলে নয়। অন্যভাবে বলা যায়, **আইনের উপযোগিতা সম্পর্কে উপলব্ধিই আইন মান্য করার প্রধানতম কারণ।**

[গ] ***আন্তর্জাতিক সমাজ ও আইনের দিক থেকে সমালোচনা :*** বহুত্ববাদের প্রবক্তাগণ আন্তর্জাতিক সমাজ ও আইনের দিক থেকে সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করেন। এরূপ সমালোচনাকে নিম্নলিখিত **তিন ভাগে** ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে :

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা

[১] বিভিন্ন রাষ্ট্রকে নিয়ে আধুনিক আন্তর্জাতিক সমাজ গড়ে উঠেছে। **বর্তমানে বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।** অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও প্রতিযোগিতার পরিবর্তে **পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা বর্তমান আন্তর্জাতিক সমাজের প্রধান নীতি** হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি, **বিরোধ ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জোটবদ্ধতার প্রবণতা** বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর অর্থ—আজকের আন্তর্জাতিক সমাজে কোনো রাষ্ট্রই সম্পূর্ণ এককভাবে কোনো কিছু করতে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় **একত্ববাদীদের সর্বশক্তিমান ও অনিয়ন্ত্রিত সার্বভৌম রাষ্ট্রের তত্ত্ব গুরুত্বহীন** হয়ে পড়েছে।

বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার ওপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ

[২] রাষ্ট্রের **দু'ধরনের সার্বভৌমিকতা** থাকে, যথা—**অভ্যন্তরীণ** এবং **বাহ্যিক**। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের মতো **বাহ্যিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নানাভাবে সীমাবদ্ধ**। বিভিন্ন প্রকার আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা, চুক্তি, বিশ্ব-জনমত প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে **কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।** কোনো রাষ্ট্র তা করলে বিশ্ব-জনমত তার বিরুদ্ধাচরণ করবে। তা ছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রের আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রয়েছে **নানা প্রকার আন্তর্জাতিক আইন** এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ**। অনেকে জাতিপুঞ্জকে 'বিশ্ব-রাষ্ট্র' (world state) গঠনের সুদৃঢ় পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন। এমতাবস্থায় **কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই চরম, সীমাহীন ও অনিয়ন্ত্রিত সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করা অসম্ভব।** তাই সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্ব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'মিথ্যা পরিহাসে' পরিণত হয়েছে বলে বহুত্ববাদীরা মনে করেন।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী

[৩] আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্র যদি **সীমাহীন ও চরম সার্বভৌম ক্ষমতা** ভোগ করতে চায়, তাহলে **যুদ্ধ অনিবার্য** হয়ে উঠবে। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে বৃহৎ ও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিহীন রাষ্ট্রসমূহকে গ্রাস করার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। অন্যদিকে আবার শক্তিহীন রাষ্টগুলিকে গ্রাস করার প্রশ্নে **বৃহৎ ও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়** লিপ্ত হবে। এমতাবস্থায় **মানব সভ্যতা চরম সংকটের মুখে পড়বে।** এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **ল্যাস্কি** বলেছেন যে, কোনো রাষ্ট্রের অবাধ ইচ্ছা মানব-জাতির পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। এদিক থেকে বিচার করে সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বকে **বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার হন্তারক** হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বহুত্ববাদের সমালোচনা (Criticism of Pluralism)

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া হিসেবে **বহুত্ববাদ** এক সময়ে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও এই তত্ত্বের **সীমাবদ্ধতাগুলিকে** কোনোমতেই উপেক্ষা করা যায় না। **কোকার, মরিস কোহেন** (Morris Cohen), **লিপসন** (Lipson), এমনকি একদা বহুত্ববাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক **ল্যাস্কি** প্রমুখ নানা দিক থেকে এর সমালোচনা করেছেন।

সার্বভৌম রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা

[১] বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌম ক্ষমতার বিরোধিতা করে বিভিন্ন সংঘ, গোষ্ঠী, সংগঠন প্রভৃতির হাতে এরূপ ক্ষমতা প্রদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার পক্ষপাতী। কিন্তু ওইসব সংঘ, গোষ্ঠী প্রভৃতি সার্বভৌম হলে ক্ষমতা বা অন্য কোনো প্রশ্নে তাদের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। এর ফলে **সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে** এবং **সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে।** এমতাবস্থায় **রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্তভাবেই অপরিহার্য** বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘ বা গোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত হলে তার পক্ষে বিরোধের নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। তাই তার হাতে **বিশেষ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন**। বলা বাহুল্য, এই ক্ষমতাই হল সার্বভৌম ক্ষমতা। তা ছাড়া, রাষ্ট্রকে এমন **কিছু বিশেষ ধরনের কাজ** করতে হয়, যেগুলি বিভিন্ন সংঘ বা গোষ্ঠী সম্পাদন করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা রক্ষা, আইন-শৃঙ্খলার সংরক্ষণ, আইনগত বিরোধের সুষ্ঠু মীমাংসা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়।

সার্বভৌমিকতার আইনগত ও নৈতিক ধারণার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থতা

[২] রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা-সংক্রান্ত ধারণা হল একটি আইনগত ধারণা। এর সঙ্গে নৈতিকতার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু বহুত্ববাদীরা **রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার আইনগত এবং নৈতিক ধারণার মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্ণয় করেননি।** তাই একত্ববাদীরা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার কেবল আইনগত দিকটি নিয়ে আলোচনা করলেও বহুত্ববাদীরা **অকারণে** তাঁদের **সমালোচনা** করেছেন। তা ছাড়া, **রাষ্ট্রের ক্ষমতা যে নৈতিকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ—একথা একত্ববাদীরা অস্বীকার করেন না।** সর্বোপরি, বহুত্ববাদীরা বিভিন্ন সংঘ, গোষ্ঠী প্রভৃতির হাতে **যে-ক্ষমতা প্রদানের দাবি** জানান, **তার ভিত্তি হল নৈতিকতা,** আইন নয়। এইসব কারণে গেটেল বহুত্ববাদীদের সমালোচনা করেছেন।

একাধিক আনুগত্যের ধারণা ভ্রান্ত

[৩] বহুত্ববাদীদের মতে, প্রতিটি ব্যক্তি **একই সঙ্গে একাধিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন** করে। এর অর্থ—ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রতি যেমন আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়, তেমনি আনুগত্যশীল থাকতে হয় সেইসব সংঘ বা গোষ্ঠীর কাছে, যেগুলির সদস্যপদ সে গ্রহণ করেছে। কিন্তু **কার্ল স্মিট** (Carl Schmit) এরূপ একাধিক আনুগত্যের ধারণাটিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। কারণ, **আনুগত্য একাধিক হলে বিভিন্ন ধরনের আনুগত্যের মধ্যে বিরোধ বাধা স্বাভাবিক।** তা ছাড়া, একই **ব্যক্তি** বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের প্রতি **কখনোই সমান আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারে না।** সর্বোপরি, একাধিক আনুগত্য **ব্যক্তির অভিন্ন সত্তাকে খণ্ডিত** করে।

রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন নয়

[৪] বহুত্ববাদ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে সমালোচনা করা হয়। বহুত্ববাদীরা **রাষ্ট্র ও সরকারকে** অভিন্ন বলে মনে করলেও এদের মধ্যে যে **মৌলিক পার্থক্য** রয়েছে, তা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। **সরকার হল রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র।** ব্যক্তিকে সমষ্টি বলে মনে করলে যে-ভুল করা হয়, সরকারকে রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করলে সেই একই ভুল করা হবে। **গার্নার** রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত **হয়েছেন** যে, মস্তিষ্ক যেমন জীবদেহের প্রধান পরিচালক, তেমনি সরকার হল রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক। তা ছাড়া, **সরকার বিভিন্ন ধরনের** হতে পারে। **কিন্তু সব রাষ্ট্রই অভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন** হয়। সর্বোপরি, সরকারের বিরোধিতা করার অধিকার সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই স্বীকৃত ; কিন্তু রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার অধিকার জনসাধারণের নেই। বস্তুত, **সরকার-বিরোধী হওয়ার অর্থ রাষ্ট্র-বিরোধী হওয়া নয়।**

সংঘ বা গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, যৌথ চেতনা প্রভৃতি নেই

[৫] বহুত্ববাদীরা সমাজের **বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সংঘের 'স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব'** (corporate personality), **'স্বাধীন সত্তা', 'যৌথ চেতনা'** প্রভৃতি রয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু সমালোচকরা এরূপ ধারণাকে **অলীক ধারণা বা কষ্ট-কল্পনা** বলে সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে **কোহেনের** বক্তব্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন যে, কোনো একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককেই গোষ্ঠীর ঐক্য বলে চিহ্নিত করা হয়। এরূপ বিশেষ ধরনের সম্পর্কের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এরূপ সম্পর্কের মাধ্যমে কোনো গোষ্ঠীরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। বস্তুত, কোনো গোষ্ঠী বা সংঘের এমন কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন সত্তা বা যৌথ চেতনা নেই, যা তাকে সদস্যদের থেকে পৃথক রাখে। বরং, সদস্যদের পরিচয়েই যে-কোনো গোষ্ঠী পরিচিত হয়। এদিক থেকে বিচার করে **বহুত্ববাদকে একটি ভ্রান্ত তত্ত্ব** হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

স্ব-বিরোধিতা

[৬] বহুত্ববাদী তত্ত্বের অন্যতম প্রধান ত্রুটি হল এর **স্ব-বিরোধিতা।** তত্ত্বগতভাবে বহুত্ববাদীরা **রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস এবং কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণের কথা** বললেও বাস্তবে তাঁরা তাঁদের **প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনাসমূহ** (institutional plans)-**কে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রের হাতে প্রভূত ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতী। গিয়ার্কে** সংঘসমূহের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য (autonomy) প্রতিষ্ঠার সপক্ষে ওকালতি করলেও সাধারণ স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করতে আপত্তি করেননি। অনুরূপভাবে **ল্যাস্কিও** বলেছিলেন, আইনগতভাবে কেউ একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের এমন কতকগুলি অঙ্গ (organ) রয়েছে, যাদের কর্তৃত্ব সীমাহীন (unlimited)।

অস্পষ্টতাদোষে দুষ্ট

[৭] বহুত্ববাদের সমালোচনা করতে গিয়ে **কোকার** মন্তব্য করেছেন যে, বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও **রাষ্ট্রের কোন্ কোন্ ক্ষমতার**

তাঁরা বিরোধী সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোনো কিছু তাঁদের তত্ত্বে বলা হয়নি। তাই তাঁদের তত্ত্বকে অস্পষ্টতাদোষে দুষ্ট বলে সমালোচনা করা যায়। অন্যদিকে, তাঁরা যাঁদের তত্ত্বের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন, সেই একত্ববাদীদের বক্তব্যের মধ্যে কোনোরূপ অস্পষ্টতা নেই।

ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের তত্ত্ব ভ্রান্ত

[৮] অন্য একটি দিক থেকেও কোকার বহুত্ববাদের সমালোচনা করেছেন। বহুত্ববাদীরা ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের হাতে চরম ক্ষমতা প্রদানের বিরোধী। কিন্তু কোকার মন্তব্য করেছেন যে, **রাষ্ট্রীয় চরমতা থেকে মুক্ত** (freedom from state-absolutism) **হলেই যে ব্যক্তির স্বাধীন উদ্যোগ সম্প্রসারিত হবে—এমন কোনো কথা নেই।** বরং সেক্ষেত্রে বিপরীত কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনাই প্রবল। জিমার্ন (Zimmern)-এর মতে, গোষ্ঠী আকৃতি যতই ক্ষুদ্র হবে, সদস্যদের জীবন ও কার্যাবলির ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ততই সুদৃঢ় হবে।

একত্ববাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রে ব্যর্থতা

[৯] বহুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল—একত্ববাদের মূল বক্তব্যকে যথাযথভাবে উপলব্ধি না করেই তাঁরা এর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুলেছেন। **সামাজিক নীতি ও যুক্তির দিক থেকে একত্ববাদীরা কখনোই রাষ্ট্রকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে গড়ে তুলতে চাননি।** এমনকি, জনস্বার্থের বিরোধিতা করে রাষ্ট্র-ক্ষমতা প্রয়োগ করা হলেও তার বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না—এমন কথাও একত্ববাদীরা বলেননি। তাঁরা যা বলতে চেয়েছেন, তা হল—**সম-প্রকৃতিসম্পন্ন অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট রাষ্ট্র আইনগতভাবে দায়িত্বশীল থাকবে না।** তা ছাড়া, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার অধিকারী রাষ্ট্র অন্যের ওপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করে, সেইসব বিধিনিষেধ কখনোই তার নিজের ওপর আরোপিত হতে পারে না। **একত্ববাদীদের এই বক্তব্যের মধ্যে অন্যায় বা অযৌক্তিক কিছু নেই** বলে কোকার মন্তব্য করেছেন।

মধ্যযুগীয় বিশৃঙ্খলা ও অবাধ নৈরাজ্যের প্রতিষ্ঠা

[১০] বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা এবং ব্যক্তির আনুগত্যকে বিভক্ত করে সমাজের মধ্যে **মধ্যযুগীয় বিশৃঙ্খলা ও আধা-নৈরাজ্যের পথ প্রশস্ত** করে দিয়েছে বলে অনেকের অভিযোগ। মধ্যযুগে রাষ্ট্র, গীর্জা, সামন্ত-প্রভু ও বিভিন্ন গোষ্ঠী (clan)-র মধ্যে সার্বভৌমিকতা বিভক্ত ছিল। ফলে ওই সময় সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছিল। কিন্তু **বর্তমানে এরূপ অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা আদৌ কাম্য নয়।** তাই বহুত্ববাদীদের বক্তব্যকে সমর্থন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আইন-সংক্রান্ত ধারণা ভ্রান্ত

[১১] অনেকে **বহুত্ববাদীদের আইন-সংক্রান্ত ধারণাকে ভ্রান্ত বলে সমালোচনা** করেন। কোকার অত্যন্ত সঠিকভাবে দ্যুগুই, ক্র্যাবে প্রমুখকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আইনসভা কিংবা আইন প্রণয়নকারী **একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কেউ আইনগতভাবে আইন প্রণয়ন করার অধিকারী নয়।** বহুত্ববাদীদের বর্ণিত 'সামাজিক সংহতি' (social solidarity), ব্যক্তির 'ভালো-মন্দ সম্পর্কিত বোধ' (sense of right) প্রভৃতি কখনোই এমন আইন প্রণয়ন করতে পারে না, যেগুলি সম্পর্কে আদালত ব্যাখ্যা দিতে পারে কিংবা যেগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

রাষ্ট্রের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে উপলব্ধির অভাব

[১২] একদা বহুত্ববাদের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক ল্যাস্কি পরবর্তী সময়ে **মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বহুত্ববাদের সমালোচনা** করেন। তাঁর মতে, **শ্রেণি-সম্পর্কের প্রকাশ হিসেবে** (as an expression of class relations) **রাষ্ট্রের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে বহুত্ববাদীরা ব্যর্থ** হয়েছেন। শ্রেণি-বিন্যস্ত সমাজে প্রচলিত সম্পত্তি-সম্পর্ককে রক্ষা করাই হল রাষ্ট্রের প্রধানতম কাজ। আর এই কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য তার প্রয়োজন সার্বভৌম ক্ষমতা। তাই এরূপ সমাজে সংঘ বা গোষ্ঠীগুলির হাতে কখনোই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করা হয় না। **কেবল শ্রেণিহীন সমাজে বহুত্ববাদ কার্যকর হতে পারে** বলে মনে করা হয়।

বহুত্ববাদের গুরুত্ব (Importance of Pluralism)

ল্যাস্কি, কোলেট প্রমুখের অভিমত

নানাপ্রকার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও **বহুত্ববাদের গুরুত্বকে** উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না। অধ্যাপক **ল্যাস্কি তিনটি দিক থেকে বহুত্ববাদের গুরুত্ব** সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। *প্রথমত*, বিশুদ্ধ **আইনগত কোনো তত্ত্বের সাহায্যে রাষ্ট্রকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা** যে **অসম্ভব**, তা বহুত্ববাদীরা অতি বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। *দ্বিতীয়ত*, বহুত্ববাদীরা এই সত্যের প্রতি

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আইনগত দিক থেকে অন্যান্য সংঘ অপেক্ষা রাষ্ট্র অধিক আনুগত্য দাবি করতে পারলেও নৈতিক অধিকার বা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিক থেকে রাষ্ট্র তা করতে পারে না। তৃতীয়ত, বহুত্ববাদ অত্যন্ত সঠিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে যে, রাষ্ট্রের ধারণা হল প্রধানত একটি ক্ষমতার ধারণা এবং তা দমনমূলক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। তাই নৈতিক দিক থেকে তা মূল্যমান-নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত হয়। ল্যাস্কির মতো শ্রীমতী ফোলেটও তাঁর *দ্য নিউ স্টেট (The New State)* নামক গ্রন্থে বহুত্ববাদের গুরুত্বকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যাই হোক, গুরুত্বের যেসব দিক ল্যাস্কি আলোচনা করেছেন, সেগুলি ছাড়াও বহুত্ববাদের অন্যান্য ইতিবাচক দিক হল—[১] এমন একটি সময়ে রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে বহুত্ববাদের আবির্ভাব ঘটে, যখন সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি ও তার স্বাধীনতাকে বলিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিভিন্ন সংঘ, গোষ্ঠী প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে বহুত্ববাদীরা অনিবার্য অপমৃত্যুর হাত থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছিলেন। [২] ফোলেটের মতে, 'স্থানীয় ইউনিট'গুলির পুনরুজ্জীবনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বহুত্ববাদীরা কার্যত ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই। [৩] তাঁরা একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, রাষ্ট্রের স্বার্থ সব সময় তার অংশগুলির স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন হয় না। [৪] বহুত্ববাদের আবির্ভাবের ফলে 'জনতা' (Crowd)-সংক্রান্ত ধারণার গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। [৫] বহুত্ববাদীরা সামাজিক সংঘ ও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে কার্যত পেশাগত বা কার্যগত প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব প্রচারে সহায়তা করেছেন।

উপসংহার

যথেষ্ট অবদান থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে বহুত্ববাদের গুরুত্ব হ্রাসের পেছনে প্রধানত তিনটি কারণ রয়েছে বলে মনে করা হয়। *প্রথমত*, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংকটময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা প্রদান করা হয়। *দ্বিতীয়ত*, বিশের দশকের একেবারে শেষ দিকে বিশ্বব্যাপী চরম অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি প্রবল আকার ধারণ করে। এর ফলে বহুত্ববাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। *তৃতীয়ত*, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জনকল্যাণকর ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের ভূমিকা ও গুরুত্বকে অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য সাম্প্রতিককালে বিশ্বের বিভিন্ন উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রক্ষণশীল বুর্জোয়া সরকারের শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ ও বহুত্বকরণের দাবিতে রিচার্ড হোম (Richard Holme) প্রমুখ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব (Theory of Limited Sovereignty)

অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের তত্ত্ব

সার্বভৌমিকতার সনাতন বা সাবেকি তত্ত্ব অনুসারে সার্বভৌমিকতা হল রাষ্ট্রের অসীম, অবাধ, চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা। বোদাঁ, হবস্, বেন্থাম, অস্টিন প্রমুখ হলেন এরূপ তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা। সার্বভৌমিকতার এই আইনগত একত্ববাদী তত্ত্বের প্রবক্তারা প্রচার করেছেন যে, সার্বভৌম ক্ষমতা যেহেতু চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা, সেহেতু তার ওপর কেউ কোনোরকম বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে না। এমনকি, সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী আইন প্রণয়ন করে বলে সে নিজে আইনের উর্ধ্বে অবস্থান করে।

সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের প্রবক্তাগণ

কিন্তু ব্রাইস, ব্লুন্টস্‌লি, ল্যাস্কি, স্টিফেন (Stephen) প্রমুখের মতে, সার্বভৌমিকতা কখনোই অসীম ও চরম ক্ষমতা বলে বিবেচিত হতে পারে না। ব্রাইসের মতে, কেউ কেউ সার্বভৌমিকতাকে অপ্রতিরোধ্য ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বলে বর্ণনা করলেও সর্বপ্রকার বাধা-বন্ধনহীন অসীম ও চূড়ান্ত কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-গোষ্ঠীর সন্ধান কখনোই পাওয়া যায়নি। ব্লুন্টস্‌লি বলেছেন যে, পৃথিবীতে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। এমনকি রাষ্ট্রও সর্বশক্তিমান নয়। কারণ, বাহ্যিক দিক থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা এবং অভ্যন্তরীণ দিক থেকে নিজের প্রকৃতি ও তার সাধারণ সদস্যদের অধিকারের দ্বারা তা সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে, ল্যাস্কি প্রমুখ বহুত্ববাদী কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতাকে রাষ্ট্রদর্শনের একটি মৌলিক বিষয় বলে চিহ্নিত করেছেন। স্টিফেনের মতে, রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক—উভয় দিক থেকেই সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের প্রবক্তাগণ একত্ববাদী তত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা অসীম ও চরম হতে পারে না, তা নানা দিক থেকে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ওপর যেসব সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে—

প্রাকৃতিক অধিকারের দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ

[১] অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জনগণের অধিকারের দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ বলে অনেকে মনে করেন। লক্, ব্লুন্টস্‌লি প্রমুখ এরূপ সীমাবদ্ধতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এঁদের মতে, জনগণের এমন কতকগুলি প্রাকৃতিক অধিকার থাকে, যেগুলি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সার্বভৌম শক্তি ওইসব অধিকার খর্ব বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

ধর্ম, নৈতিকতা, প্রথা, জনমত প্রভৃতির দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ

[২] সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা **ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিকতা, সামাজিক প্রথা, ন্যায় সম্পর্কিত নীতিবোধ, জনমত প্রভৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ।** এমনকি, একত্ববাদী **বোদাঁ** এবং **গ্রোটিয়াস (Grotius)** প্রমুখ মনে করতেন যে, **প্রাকৃতিক আইন** এবং **ঐশ্বরিক বিধান (Divine Law)**-এর দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ। এমনকি, চরম ও অসীম সার্বভৌম ক্ষমতার সমর্থক **রুশোও** সার্বভৌমিকতার ওপর **প্রাকৃতিক আইনের নিয়ন্ত্রণকে** অস্বীকার করতে পারেননি। প্রাকৃতিক আইনের মতো ধর্মও সার্বভৌমিকতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সক্ষম। উদাহরণ হিসেবে সর্বশক্তিমান ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই, তুরস্কের সুলতান প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যায়। **চতুর্দশ লুই সদম্ভে নিজেকে 'রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা** করলেও ফরাসি জনগণের ওপর প্রোটেস্টান্ট ধর্মকে জোর করে চাপিয়ে দিতে সাহস পাননি। এমনকি, তুরস্কের সুলতান কিংবা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারও জনগণের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হননি। ধর্মবিশ্বাস ছাড়াও নৈতিকতা, চিরাচরিত প্রথা প্রভৃতি নিশ্চিতভাবেই সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সমর্থ। কোনো দেশের সরকারই এগুলিকে উপেক্ষা করে আইন প্রণয়ন কিংবা আইন রূপায়ণ করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে ব্রিটিশ কিংবা মার্কিন সরকারের কথা বলা যেতে পারে। সর্বোপরি, **জনমতকে** উপেক্ষা করে কোনো সার্বভৌম শক্তির পক্ষেই সুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়। কোনো সরকার জনমতকে উপেক্ষা করে স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে সাংবিধানিক উপায়ে কিংবা বিপ্লবের মাধ্যমে জনসাধারণ সেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

সংবিধান ও সাংবিধানিক আইনের দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ

[৩] অনেকে **সংবিধান ও সাংবিধানিক আইনের দ্বারা সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ** বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁদের মতে, **সংবিধান** রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সরকারের গঠন ও কার্যাবলি নির্ধারণ করে দেয়। বিশেষত, যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। আইনসভা কর্তৃক সংবিধান-বিরোধী কোনো আইন প্রণীত হলে কিংবা শাসন বিভাগ সংবিধান-বিরোধী কোনো নির্দেশ দিলে বা কোনো কাজ করলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সেগুলিকে বাতিল করে দিয়ে সংবিধানের প্রাধান্য ও পবিত্রতা রক্ষা করে। তা ছাড়া, যেহেতু **সাংবিধানিক** আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এবং সাংবিধানিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সাধারণ আইনসমূহ প্রণীত হয়, সেহেতু সাংবিধানিক আইন সাধারণ আইনের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। এরূপ **আইনের দ্বারা সার্বভৌম নিয়ন্ত্রিত** হতে বাধ্য।

বহুত্ববাদীদের অভিমত

[৪] বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রকে 'একটি অদ্বিতীয় সংস্থা' বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, সমাজের মধ্যে **রাষ্ট্র ছাড়াও নানা প্রকার সংঘ, গোষ্ঠী, সংগঠন প্রভৃতি** থাকে। এগুলি **রাষ্ট্রের মতোই সার্বভৌম** ক্ষমতার অধিকারী। **গিয়ার্কে ও মেটল্যান্ডের** মতে, ওইসব সংঘ সামাজিক প্রয়োজনে স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে। তাই এগুলির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ। **রাষ্ট্র কখনোই এদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।** বরং, তাদের কার্যাবলির মধ্যে কেবল সমন্বয় সাধনের জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন বলে ল্যাস্কি মনে করেন। তা ছাড়া, **রাষ্ট্রের উৎপত্তির বহু পূর্ব থেকেই এগুলির অস্তিত্ব** রয়েছে বলে রাষ্ট্র এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সর্বোপরি, রাষ্ট্র মানুষের কেবলমাত্র **বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও তা ব্যক্তির অন্তর্জীবনের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।** অন্তর্জীবনের সার্বিক বিকাশের জন্য ওইসব সংস্থা বা গোষ্ঠীর প্রয়োজন। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন প্রকার সংস্থা, গোষ্ঠী প্রভৃতিকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করে বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের অবাধ সার্বভৌম ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছেন।

আন্তর্জাতিক আইন কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধ

[৫] **আন্তর্জাতিক আইনবিদদের** মতে, বর্তমানে **কোনো রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম নয়।** কারণ, কোনো রাষ্ট্রই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করতে পারে না। তাদের প্রত্যেককে **আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতি মেনে চলতে হয়।** তা ছাড়া, বর্তমানে কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অর্থনৈতিক,

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তাদের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিশ্চিতভাবেই কিছুটা পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করে। সর্বোপরি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামক যে-আন্তর্জাতিক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার নীতিসমূহ ও নির্দেশাবলি প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে মেনে চলতে হয়। ফলে, রাষ্ট্রগুলির বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতা যে কিছুটা পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **জেমস্ কালাঘান** বলেছিলেন যে, বর্তমানে প্রকৃত স্বাধীন জাতিসমূহ-সংক্রান্ত ধারণা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এখন কোনো আধুনিক রাষ্ট্রই বিশ্ব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে এবং নিজের পূর্ব-নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করতে পারছে না।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, আইনগত বিচারে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা অবাধ, অসীম, চরম ও চূড়ান্ত হলেও বাস্তবে উপরিউক্ত নিয়ন্ত্রণগুলি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই ল্যাস্কি মন্তব্য করেছেন যে, কোথাও এমন কোনো সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ নেই যে অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

সমালোচনা (Criticism)

নানা দিক থেকে সীমাবন্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটিকে সমালোচনা করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক অধিকার আইনগত নিয়ন্ত্রণ আরোপে অক্ষম

[১] এই তত্ত্বের প্রবক্তারা প্রাকৃতিক অধিকারের দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবন্ধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সমালোচকদের মতে, তাঁরা **প্রাকৃতিক অধিকার** হিসেবে যেগুলিকে চিহ্নিত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি **কাল্পনিক অধিকার ছাড়া আর কিছুই নয়**। এইসব অধিকার আইনের পরিবর্তে সামাজিক স্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত নয় এমন কোনো অধিকারকে আইনগত অধিকার হিসেবে আদৌ স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। সুতরাং, **প্রাকৃতিক অধিকারসমূহকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ওপর নিয়ন্ত্রণ-আরোপকারী উপাদান হিসেবে কখনোই গ্রহণ করা সম্ভব নয়।**

ধর্ম, নৈতিকতা প্রভৃতির দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবন্ধ নয়

[২] **গার্নার** প্রমুখ আইনগত দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ধর্ম, নৈতিকতা, প্রথা, জনমত প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণকে সার্বভৌমিকতার ওপর আদৌ নিয়ন্ত্রণ বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, **প্রাকৃতিক আইন বা ঐশ্বরিক আইনকে প্রয়োগ করার জন্য কোনো সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ নেই**। আবার, **ধর্ম, নৈতিকতা, প্রথা** প্রভৃতির গুরুত্বকে অস্বীকার করা না গেলেও সেগুলিকে **মেনে চলতে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয়**। তা ছাড়া, সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলে সেগুলি আর নৈতিক প্রকৃতিসম্পন্ন থাকে না। সেগুলি তখন **আইনগত মর্যাদা** লাভ করে। বলা বাহুল্য, কোনো সার্বভৌম তাঁর নিজের সৃষ্ট আইনের দ্বারা সীমাবন্ধ নয়। তাই ধর্ম, নৈতিকতা, প্রথা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ওপর কোনোরকম আইনগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে না।

সাধারণ ও সাংবিধানিক আইনের দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবন্ধ নয়

[৩] সীমাবন্ধ সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের প্রবক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সংবিধান ও সাংবিধানিক আইনের দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবন্ধ। কিন্তু অনেকে একথা মেনে নিতে রাজি নন। তাঁদের মতে, **সংবিধান** সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারলেও **রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়**। কারণ, কেবল **রাষ্ট্রই হল সংবিধানের প্রণেতা এবং সংরক্ষণ ও সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষ**। তাই রাষ্ট্রের সৃষ্ট সংবিধান কখনোই তার সৃষ্টিকর্তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। তবে কেউ কেউ সাংবিধানিক আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে কোনোরূপ মৌলিক পার্থক্য আছে বলে মনে করেন না। কারণ, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **গেটেল** বলেছেন যে, সাধারণ আইনের মতো সাংবিধানিক আইনও রাষ্ট্রের 'সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছার প্রকাশ' (expression of the will of the state) মাত্র। তাই আইনগত দিক থেকে **সাধারণ আইন কিংবা সাংবিধানিক আইন কোনোটিই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ওপর কোনোরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করতে সক্ষম হয় না**। অবশ্য রাষ্ট্র নিজের সৃষ্ট সংবিধানের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় নিজের ওপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। অধ্যাপক **ডাইসি** এইসব নিয়ন্ত্রণকে **'স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ'** (self-imposed restrictions) বলে চিহ্নিত করেছেন।

সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের অনন্য ক্ষমতা

[৪] বহুত্ববাদীরা সমাজের বিভিন্ন ধরনের সংঘ, গোষ্ঠী প্রভৃতিকে রাষ্ট্রের মতোই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু আইনগত দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ওইসব সংঘ, গোষ্ঠী প্রভৃতির কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। স্বাভাবিক কারণে তারা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। বস্তুত, রাষ্ট্র ওইসব সংস্থা ও গোষ্ঠীর কার্যকলাপকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি তাদের পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালিশের ভূমিকা পালন করে। তাই ল্যাস্কির মতো বহুত্ববাদীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের এমন কতকগুলি অঙ্গ রয়েছে, যাদের কর্তব্য সীমাহীন।

আন্তর্জাতিক আইন সার্বভৌমিকতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপে অক্ষম

[৫] আন্তর্জাতিক আইনবিদদের অনেকেই মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে সক্ষম। কিন্তু সমালোচকরা তাঁদের এই যুক্তি মেনে নিতে রাজি নন। কারণ, আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত অর্থে আইন বলা যায় না। তাই হল্যান্ড আন্তর্জাতিক আইনকে **'বিধিশাস্ত্রের বিলয়স্থান'** (vanishing point of jurisprudence) বলে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া, জাতীয় আইনের মতো আন্তর্জাতিক আইনকে বলবৎ করার জন্য কোনো সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ নেই। সর্বোপরি, বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা, চুক্তি প্রভৃতি মান্য করে। কোনোও রাষ্ট্র এগুলিকে অবজ্ঞা করলে তার বিরুদ্ধে আইনগতভাবে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য একথা সত্য যে, এগুলির পেছনে বিশ্ব-জনমত ও বিশ্ব-বিবেকের সমর্থন থাকে বলে আইনগতভাবে না হলেও নীতিগতভাবে কোনো রাষ্ট্রই সেগুলিকে অমান্য বা উপেক্ষা করতে পারে না।